Department of Political Science

Local Government in West Bengal

SEM VI (Hons.)

DSE 3

ANIRBAN DAS

নারীর ক্ষমতায়ন

বিগত কয়েক সহস্রাব্দে **ভারতীয় নারীর** অবস্থা বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। প্রাচীণযুগ থেকে মধ্যযুগে, তাদের অবস্থার অবনতি আর কয়েকজন সমাজসংস্কারকের প্রচেষ্টায় আবার সমমর্যাদার অধিকারে উত্তরণের ইতিহাস বেশ ঘটনাবহুল। আধুনিক ভারতে নারীরা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার অধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছেন।

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত নারীর অধিকারের অর্ন্তভুক্ত মূল বিষয়গুলি হল সাম্য, মর্যাদা,বৈষম্য থেকে স্বাধীনতা। এছাড়াও, নারীর অধিকার সংক্রান্ত বহু বিধি প্রযোয্য

2018 সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি, লোকসভার(সংসদের নিম্নকক্ষ) অধ্যক্ষ, লোকসভার বিরোধী দলনেতা তিনটি পদই অলংকৃত করেন মহিলারা। যদিও আজও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মহিলারা লিঙ্গবৈষম্য ও অপরাধের শিকার।

স্বাধীন ভারত

ভারতে নারীরা এখন শিক্ষা, ক্রীড়া, রাজনীতি, গণমাধ্যম, শিল্প ও সংস্কৃতি, সেবা খাত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করছেন।ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম সময়যাবত্ দায়িত্ব সামলানো নারী প্রধানমন্ত্রী, যিনি একটানা পনের বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ভারতের সংবিধান সব ভারতীয় নারীকে সাম্য(ধারা ১৪), রাষ্ট্রের দ্বারা কোন বৈষম্যের মুখোমুখি না হওয়া(অনুচ্ছেদ ১৫(১)), সমান সুযোগলাভ(ধারা ১৬) এবং একই কাজের জন্য সমান বেতন(ধারা ৩৯(ডি) এবং ধারা 42) লাভের অধিকার দিয়েছে। এছাড়াও, সংবিধান নারী ও শিশুদের সুবিধার্থে রাজ্য কর্তৃক বিশেষ বিধান প্রণয়নকে মান্যতা দেয়, নারীর প্রতি অবমাননামূলক আচরণের বিরোধিতা করে(আর্টিকেল ৫১(এ)(ই)) এবং কাজকর্মের অনুকূল সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি করার ও মাতৃত্বকালীন সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা যাতে রাজ্য করতে পারে, সেই সংস্থান রাখে(ধারা ৪২)।

ভারতে নারীবাদী কর্মকান্ডের সক্রিয়তা ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে গতি লাভ করে। জাতীয় স্তরের যে বিষয়গুলি প্রথম নারীবাদী সংগঠনগুলিকে সংঘবদ্ধ করে মথুরা ধর্ষণ মামলা তাদের মধ্যে একটি। ১৯৭৯-১৯৮০ সালে থানায় ভিতর মথুরা নামের একটি অল্পবয়সী মেয়েকে ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীরা বেকসুর খালাস পাওয়ায় দেশব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলি দ্বারা ব্যাপকভাবে

প্রচারিত এইসমস্ত বিক্ষোভ সরকারকে প্রমাণ সংক্রান্ত আইন(Evidence Act), ফৌজদারী কার্যবিধি(Criminal Procedure Code) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির(Indian Penal Code) সংশোধন করতে বাধ্য করে; এবং হেফাজতে থাকাকালীন ধর্ষণ(custodial rape) নামে একটি নতুন অপরাধ নথিবদ্ধ হয়। শিশুকন্যা হত্যা, লিঙ্গ বৈষম্য, নারী স্বাস্থ্য, নারী নিরাপত্তা এবং নারী শিক্ষার মতো বিষয়গুলি নিয়েও নারী আন্দোলনের কর্মীরা একতাবদ্ধ হন।

যেহেতু ভারতবর্ষে মদ্যাশক্তি অধিকাংশ সময়েই নারীদের বিরুদ্ধে হিংসার সঙ্গে জড়িত, তাই বেশ কয়েকটি মহিলা সংগঠন অন্ধ্র প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যে মদ বিরোধী প্রচার শুরু করে। অনেক ভারতীয় মুসলিম নারী শরীয়তের আইন অনুসারে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন এবং তিন তালাক ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন(২০১৭ এর ঘটনাবলী জানতে নিচে দেখুন)।

১৯৯০ এর দশকে বেশ কিছু বিদেশী সংস্থার অনুদানে কিছু নতুন নারী-কেন্দ্রিক বেসরকারি সংগঠন গড়ে ওঠে। এইসব স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং "স্ব-নিযুক্ত নারী সমিতি" (Self Employed Women's Association বা সেবা)-র মতো বেসরকারি সংগঠন ভারতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্থানীয় আন্দোলনের নেতা হিসেবে উঠে এসেছেন মেধা পাটেকারের(নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন) মতো বহু প্রভাবশালী নারী।

ভারত সরকার ২০০১ সালকে নারীর ক্ষমতায়ন বা স্বশক্তি বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেন। নারী ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় নীতিটি পাস ২০০১ সালেই হয়।

২০০৬ সালে, ইমরানা নাম্নী এক মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণের মামলটি গণমাধ্যম কর্তৃক প্রচারিত হয়। ইমরানাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করে। কিছু মুসলিম নেতাদের ধর্মীয় করা ইমরানর সঙ্গে তার শ্বশুরের বিবাহের সুপারিশ ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় এবং অবশেষে ইমরানার শ্বশুরের ১০ বছরের কারাদন্ড হয়। এই রায়কে বহু মহিলা সমিতি এবং সর্বভারতীয় মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বোর্ড(All India Muslim Personal Law Board) স্বাগত জানায়।

থমসন রয়টার্সের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত মহিলাদের জন্য বিশ্বের চতুর্থ বিপজ্জনক দেশ। রিপোর্টটিতে ভারত জি-২০ দেশগুলির মধ্যে নারীদের জন্য সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর দেশ হিসেবেও উল্লিখিত হয়, তবে এই রিপোর্টটি ভ্রান্তিযুক্ত হওয়ার জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ৯ মার্চ ২০১০ তারিখে, আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসের একদিনের পর, রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হয়, যা ভারতের সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষিত করে। ২০১৭ সালে থমসন রয়টার্স কর্তৃক প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় অনুযায়ী,দিল্লী মহিলাদের জন্য চতুর্থ বিপজ্জনকতম মহানগর(বিশ্বের ৪০ টি মহানগরের মধ্যে) এবং মহিলাদের উপর যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ ও হয়রানির ঝুঁকিতে এটি বিপজ্জনকতম মহানগর।

২০১৪ সালে, মুম্বাইয়ের একটি ভারতীয় পরিবার-আদালতের রায় অনুযায়ী, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে কুর্তা ও জিন্স পরিধানে বাধা দিলে এবং শাড়ি পরিধানে বাধ্য করলে তা স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুরতার প্রদর্শন হিসেবে গণ্য হবে এবং তা বিবাহবিচ্ছেদের দাবির বৈধ কারণ হতে পারে। এভাবে ১৯৫৪ সালের বিশেষ বিবাহ আইনের ২৭(১)ডি) ধারা অনুসারে নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে ওই মহিলার বিবাহবিচ্ছেদের দাবি মঞ্জুর করা হয়।

২২ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তাত্ক্ষণিক তিন তালাক (তালাক-ই-বিদ্বাত) অসাংবিধানিক বলে মন্তব্য করেন।

রাজনীতি

বিশ্বের যেসব দেশে সবচেয়ে বেশি নারী রাজনীতিবিদ আছেন, ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পিকার, বিরোধী দলনেতা সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলারা বিভিন্ন সময় দায়িত্ব সামলেছেন। ভারতের অঙ্গরাজ্য মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, রাজস্থান ও ত্রিপুরায় নারীদের জন্য পি.আর.আই গুলিতে ৫০% সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েতগুলির বেশিরভাগ প্রার্থীই নারী। বর্তমানে(২০১৫ সালে) কেরালার কোদাসেরী পঞ্চায়েতের সকল নির্বাচিত সদস্যই মহিলা। বর্তমানে ভারতের একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা।

২০১৬ সাল পর্যন্ত হিসাবে, ২৯ টি রাজ্যের মধ্যে ১২ টিতে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লিতে স্বাধীনতার পর থেকে কমপক্ষে এজন করে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

সংস্কৃতি

ভারতে মহিলাদের অবস্থা ভীষণভাবে পারিবারিক গঠনতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভারতে, পরিবার এবং পারিবারিক সম্পর্কে ভীষণরকম গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারগুলি পিতৃগোত্রজ। পরিবারগুলি সাধারণত বহু-প্রজন্মের, এবং বিবাহিত মহিলারা শ্বশুরালয়ে বাস করেন। অধিকাংশ পরিবারে নবীন সদস্যরা প্রবীনদের এবং মহিলারা পুরুষদের অভিভাবকত্বে থাকেন। অধিকাংশ বিবাহই একগামী (এক স্বামী এবং এক স্ত্রীর), তবে ভারতে কিছু জনকোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়েরই বহুবিবাহ করার ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতে বিবাহানুষ্ঠান বেশ ব্যয়বহুল একটি অনুষ্ঠান। ভারতে অধিকাংশ বিবাহই সম্বন্ধের মাধ্যমে স্থির হয়।

শাড়ি (লম্বা একখন্ড কাপড় যা শরীরের চারপাশে বিভিন্ন কায়দায় জড়িয়ে বা পেঁচিয়ে পড়া হয়) এবং সালোয়ার কামিজ ভারতীয় মহিলাদের প্রধান পোশাক। টিপ এদেশের মহিলাদের প্রসাধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কপালের টিপ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকার নির্দেশক নয়; তবে, সিঁথির সিঁদুর বহন করে বিবাহিতা সধবা হিন্দু মহিলার পরিচয়চিহ্ন

রঙ্গোলি (বা কোলাম) ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় একটি প্রথাগত শিল্প।

ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী, পরিবারগুলি সাধারণত দিনের শুরুতে ঈশ্বরের পূজা-উপাসনা করেন ("আরতি" -ভারতীয় পূজাপদ্ধতির অঙ্গ)।

"ভারতীয় জীবনধারা স্বাভাবিক, বাস্তব জীবনধারার দৃষ্টিকেভঙ্গিকে নির্দেশ করে। আমরা কৃত্রিমতার মুখোশ দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে রেখেছি। ভারতের মুখভঙ্গির কোমল ভাব সৃষ্টিকর্তার হাতের চিহ্ন বহন করে।".....জর্জ বার্নার্ড শ

সামরিক ক্রিয়াকলাপ

১৯৯২ সাল থেকে ভারতীয় সেনা বাহিনী চিকিৎসা বা শুশ্রুষা সংক্রান্ত নয় এমন পদেও মহিলাদের নিয়োগ করা শুরু করে। ১৯৯২ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী নারী অধিকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ২০১৩ সালের ২৫ মার্চ নারী অধিকর্তা নিয়োগ শুরু করে। ২০১৭ সালের ২৫ মার্চ, তনুশ্রি পারেখ বিএসএফ এর প্রথম মহিলা সামরিক আধিকারিক(Combat Officer) নিযুক্ত হন।

২৪ শে অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে, ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় বিমান বাহিনী (আইএএফ)-এ মহিলারা যোদ্ধা বিমানচালক(fighter pilot) হিসেবে কাজ করতে পারবেন, যার আগে মহিলাদেরা কেবলমাত্র পণ্যবাহী বিমান ও হেলিকপ্টার চালনার অনুমতি ছিল। সিদ্ধান্তটির ফলে মহিলারা বিমান বাহিনীর যেকোনও পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন। ২০১৬ সালে, ভারত সরকার তার একটি ঘোষণায় সেনা এবং নৌবাহিনীর সব বিভাগে নারীদের যুদ্ধক্ষেত্র অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি দেয়।

২০১৪ সালের হিসাবে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩%, নৌবাহিনীর ২.৮% এবং বিমান বাহিনীর ৮.৫% সদস্য মহিলা। ২০১৬ সালের হিসাবে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সকল সক্রিয় এবং সংরক্ষিত বাহিনীর ৫% নারী।

শিক্ষাক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন

১৯৯২-৯৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে মাত্র ৯.২% পরিবার নারীদের দ্বারা চালিত হয়। তবে, দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলির প্রায় ৩৫% নারীদের পরিচালনাধীন।

শিক্ষাক্ষেত্র

যদিও ভারতে মহিলা সাক্ষরতার হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবু তা এখনো পুরুষ সাক্ষরতার হারের তুলনায় কম। ছেলেদের তুলনায় কম সংখ্যক মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয় এবং অনেক মেয়েই স্কুলছুট। দেশের শহরাঞ্চলে মেয়েরা শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রায় সমান। তবে, গ্রামাঞ্চলে এখনো মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় কম শিক্ষিত হয়। ১৯৯৭ সালের জাতীয় নমুনা জরিপের তথ্য অনুযায়ী, কেবলমাত্র কেরালা ও মিজোরাম সার্বজনীন মহিলা সাক্ষরতা অর্জন করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কেরালায় নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতির প্রধান কারণ হচ্ছে সাক্ষরতা।

অপ্রথাগত শিক্ষাদান কর্মসূচি (Non-Formal Education programme বা NFE)-এর অধীনে, রাজ্যগুলির প্রায় ৪০% এন.এফ.ই কেন্দ্র এবং কেন্দ্রেশাসিত অঞ্চলগুলির প্রায় ১০% এন.এফ.ই কেন্দ্র মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী, আনুমানিক প্রায় ৩ লাখ এনএফই কেন্দ্র ৭.৪২ মিলিয়ন শিশুকে উপকৃত করছে। প্রায় ১২০,০০০ এনএফই কেন্দ্র এককভাবে মেয়েদের জন্য।

মার্কিন বাণিজ্য দপ্তরের(U.S. Department of Commerce) ১৯৯৮ সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের প্রধান বাধাগুলি হল বিদ্যালয়ে সুযোগ-সুবিধার অভাব (যেমন শৌচালয় না থাকা), শিক্ষিকার অভাব এবং পাঠ্যক্রমে লিঙ্গ বৈষম্য (মহিলাদের দুর্বল এবং অসহায় হিসাবে চিহ্নিতকরণ)।

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম: সাক্ষরতার হার নারীদের ক্ষেত্রে ৬০.৬%, এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ৮১.৩%। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ৯.২% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা আগের দশ বছরের বৃদ্ধির তুলনায় কম। ভারতে সাক্ষরতার হারে ব্যাপক লিঙ্গবৈষম্য আছে: ২০১১ সালে কার্যকরী সাক্ষরতার হার (৭ বছর বা তারও বেশি বয়সী) পুরুষদের জন্য ৮২.১৪% এবং মহিলাদের জন্য ৬৫.৪৬% ছিল। (১৫ বছর বা তারও বেশি বয়সী জনগণের থেকে পাওয়া ২০১৫ সালের তথ্য)

কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ

প্রচলিত ধারণাকে নস্যাত্ করে, ভারতের বিপুলসংখ্যক নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। জাতীয় তথ্য সংগ্রহের সংস্থাগুলি স্বীকার করে যে নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অবদান সম্পর্কে পরিসংখ্যানগুলি ভীষণরকম কমিয়ে বলে। যদিও, উপার্জনশীল কর্মীবাহিনীতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা এখনো কম। দেশের শহরাঞ্চলে বহু সংখ্যক নারী কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেন। উদাহরণস্বরূপ, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের ৩০% কর্মচারী মহিলা।

গ্রামীণ ভারতে কৃষি এবং কৃষিসংক্রান্ত শিল্প খাতে, শ্রমিকদের ৮৯.৫% নারী। সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে, মোট শ্রমিকের মোটামুটি শতকরা ৫৫% থেকে ৬৬% নারী। ১৯৯১ সালের বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে দুগ্ধোত্পাদন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ৯৪% নারী। অরণ্যভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ৫১% মহিলা।

'শ্রী মহিলা গৃহ উদ্যোগ লিজ্জত পাঁপড়' মহিলা ব্যবসায়ীদের সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। ২০০৬ সালে বায়োকন-এর প্রতিষ্ঠাতা কিরণ মজুমদার-শাহ ভারতের সবচেয়ে ধনী নারী নির্বাচিত হন। বায়োকন ভারতের প্রাচীনতম জৈবপ্রযুক্তির কোম্পানিগুনির একটি। ভারতীয় ব্যবসায়ী ললিতা ডি গুপ্তে এবং কল্পনা মোরপাড়িয়া ২০০৬ সালে ফোর্বস নির্দেশিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নারীদের(Forbes World's Most Powerful Women) তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। ললিতাদেবী অক্টোবরে ২০০৬ পর্যন্ত ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যাংক আইসিআইসিআই ব্যাংক পরিচালনা করেন এবং কল্পনাদেবী জেপি মরগান ইন্ডিয়ার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক(C.E.O.) ছিলেন।

ভূমি ও সম্পত্তির অধিকার

বেশিরভাগ ভারতীয় পরিবারে, মহিলাদের নামে কোনো সম্পত্তির মালিকানা নেই, এবং তারা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পান না। তাদের সুরক্ষার্থে থাকা আইনগুলির যথাযথ প্রয়োগের অভাবে নারীরা এখনো বহু ক্ষেত্রে জমি ও সম্পত্তির প্রকৃত অধিকার পায়না। ভারতে সম্পত্তির উপর নারীর অধিকার ধর্ম ও গোত্রের উপর নির্ভরশীল এবং বহু আইনি ও প্রথাগত জটিলতার জালে আবদ্ধ, কিন্তু মূলগতভাবে এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য নারীকে সমান ও বৈধ অধিকার প্রদান করা, বিশেষতঃ হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন(The Hindu Succession (Amendment) Act, 2005), ২০০৫ পাশ হওয়ার পর থেকে।

১৯৫৬ সালের হিন্দু ব্যক্তিগত আইন(Hindu personal laws) (হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের উপর প্রোযোজ্য) নারীকে উত্তরাধিকারেসূত্রে প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করে। পুত্রসন্তানরা পূর্বপুরুষের সম্পত্তি একটি অংশের প্রাপক ছিলেন, কিন্তু কন্যাসন্তানরা কেবলমাত্র তাদের পিতার প্রাপ্ত অংশের উপর একটি অংশ পেতেন। অতএব, একজন পিতা তার পূর্বপুরুষের সম্পত্তির দাবি ত্যাগ করলে তার কন্যা উত্তরাধিকারেসূত্রে প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন, কিন্তু তার পুত্র তার নিজের অংশের উপর অধিকার বজায় রাখতে পারতেন। উপরন্তু, বিবাহিতা মহিলা, এমনকি বৈবাহিক জীবনে নিপীড়নের সম্মুখীন মহিলাদেরও তাদের পূর্বপুরুষের বাড়িতে বসবাসের কোনো অধিকার ছিল না। ২০০৫ সালে হিন্দু আইন সংশোধনের ফলে নারী এখন পুরুষদের সমান মর্যাদা ভোগ করেন।

১৯৮৬ সালে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেন, জনৈকা বয়স্ক তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলা শাহ বানু খোরপোশ পাওয়ার অধকারী। যদিও, মৌলবাদী মুসলিম নেতারা সিদ্ধান্তটির বিরোধিতা করে অভিযোগ করেন যে আদালত তাদের নিজস্ব আইনে হস্তক্ষেপ করছেন। এরপর কেন্দ্রীয়

সরকার মুসলিম মহিলা (বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষা) আইন(Muslim Women's (Protection of Rights Upon Divorce) Act) পাস করেন।

একইভাবে, খ্রিস্টান নারীরাও বিবাহবিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকারে লাভের জন্য বহু বছর ধরে লড়াই করছেন। ১৯৯৪ সালে, নারী সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথভাবে সমস্ত গীর্জা, খৃস্টান বিবাহ এবং বিবাহ নিবন্ধকরণ বিল নামে একটি খসড়া আইন তৈরি করে। তবে, সরকার এখনও এবিষয়ে প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন করেনি। খ্রিস্টান নারীরা যাতে সম্পত্তিলাভের ক্ষেত্রে সমানাধিকার ভোগ করেন ভারতীয় আইন কমিশন ২০১৪ সালে সেজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তন করতে সুপারিশ করেন।

মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ

ভারতে ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের দাবিতে হত্যাকাণ্ড, পারিবারিক সম্মানরক্ষার্থে হত্যাকাণ্ড এবং যুবতী মেয়েদের জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার মতো অপরাধ নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ভারতে পুলিশি তথ্যভান্ডারে মহিলাদের বিরুদ্ধে বহু অপরাধ সংঘঠিত হচ্ছে বলে দেখা যায়। জাতীয় অপরাধ নিবন্ধীকরণ বিভাগ(National Crime Records Bureau) ১৯৯৮ সালে জানিয়েছিল যে ২০১০ সালের মধ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত অপরাধের বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যাবে। এর আগে, ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের পর সামাজিক কলঙ্ক লাগার ভয়ে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত অনেক অপরাধের ঘটনা পুলিশকে জানানোও হতনা। সরকারি পরিসংখ্যানে এখন নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত অপরাধে অভিযোগ নথিবদ্ধ হওয়ার সংখ্যা উল্লেযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারীর অধিকার

জাতীয় অপরাধ নিবন্ধীকরণ বিভাগ ২০১১ সালে পণের দাবিতে অত্যচারে ৮৬১৮-টি মৃত্যুর ঘটনার কথা জানায়। বেসরকারি দাবি অনুযায়ী আনুমানিক সংখ্যাটা অন্তত তিনগুণ বেশি।

ভারতে পুরুষ-নারী লিঙ্গ অনুপাতে পুরুষের সংখ্য উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যার প্রধান কারণ পরিণত বয়সে পৌঁছানোর আগেই বহু কন্যা মারা যায়। অন্যান্য বর্ণের গোষ্ঠীর তুলনায় ভারতে আদিবাসী সমাজের লিঙ্গ অনুপাতে ভারসাম্য বেশি যদিও উপজাতি সম্প্রদায়ের আয়ের মাত্রা বা সাক্ষরতার হার অনেক নিচে, স্বাস্থ্য সুবিধা অপর্যাপ্ত। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ভারতে বেশি সংখ্যক পুরুষের উপস্থিতি বালিকা শিশুর মৃত্যু ও কন্যাভ্রূণ হত্যার কথা ইঙ্গিত করে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে লিঙ্গ অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে আশঙ্কাজনক।

শব্দোত্তর-তরঙ্গ অভিবীক্ষণ(Ultrasound Scanning) মা এবং গর্ভস্থ শিশুর সুরক্ষা প্রদানের পথে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং অভিবীক্ষক যন্ত্রগুলি বহণযোগ্য হয়ে ওঠার সঙ্গেই এর সুবিধা গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও পৌঁছেছে। তবে, শব্দোত্তর-তরঙ্গ অভিবীক্ষণে গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ প্রকাশ পায়, যা গর্ভবতী মহিলাদের কন্যা ভ্রূণ হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে যাতে পরবর্তীকালে পুত্র সন্তান লাভের জন্য পুনরায় চেষ্টা করা যায়। এই অভ্যাসই সদ্যোজাত শিশুদের মধ্যে পুরুষ ও নারীর অনুপাতের পরিবর্তনের মূল কারণ বলে মনে করা হয়।

১৯৯৪ সালে ভারত সরকার শব্দোত্তর-তরঙ্গ অভিবীক্ষণের(Ultrasound Scanning) (অথবা অন্য যে কোনও পরীক্ষা যা এই তথ্য প্রদান করবে) পরে মহিলাদের বা তাদের পরিবারের তরফে শিশুর লিঙ্গ সম্পর্কে প্রশ্ন করার উপর নিষধাজ্ঞা আরোপ করে একটি আইন পাস

করে এবং চিকিত্সক বা অন্য কোন ব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে এই তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকতে বলে। বাস্তবে পণপ্রথা নিষিদ্ধকরণ আইনের মতোই এই আইনেরও যথাযথ প্রয়োগ হয়নি এবং কন্যা ভ্রূণ হত্যা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি এবং সদ্যোজাত শিশুদের লিঙ্গ অনুপাত আরও ভারসাম্য হারাচ্ছে।

কিছু গ্রামীণ এলাকায় এখনও শিশুকন্যাদের হত্যা করা হয়। কখনও কখনও পরিবারের অবহেলাও তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো পরিবার অসুস্থ কন্যার উচ্চমূল্য ওষুধের জন্য অর্থ ব্যয় না করে বা অসুস্থ কন্যার যথাযথ শুশ্রূষা না করে।

পণপ্রথার অত্যাচার বন্ধ না হওয়া ভারতে কন্যাভ্রূণ হত্যা এবং শিশুকন্যা মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষের উত্তর অঞ্চলে, প্রধানত পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশে পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটার খবর পাওয়া গেছে, যেখানে পারিবারিক স্বীকৃতি ছাড়াই বিবাহ করার জন্য বা কখনও কখনও ভিন্ন বর্ণ বা ধর্মের মানুষকে বিবাহ করার জন্য তাদের এই পরিণতি হয়। হরিয়ানা পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলির জন্য কুখ্যাত, যা কিনা হরিয়ানা গ্রামগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত বলে জানা গেছে। অপরপক্ষে, পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ড দক্ষিণ ভারতের এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মতো পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিরল বা অস্তিত্বহীন। ভারতের অন্য কিছু অংশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ড প্রায় এক শতাব্দী আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর এবং রাজা রামমোহন রায়ের মতো মনীষীদের সংস্কারমূলক আন্দোলনের ও কর্মকাণ্ডের প্রভাবে। ২০১০ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খন্ড, হিমাচলপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে সম্মান রক্ষার্থে হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে কোনো একজন মহিলার উপর অত্যাচার ভারতে বিশেষ করে উত্তর ভারতের কিছু অংশে ঘটে। ভারতীয়দের মধ্যে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়, এবং ডাইনি অপবাদে কাউকে হত্যার ঘটনাও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৩ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ডাইনি অপবাদ সংক্রান্ত ঘটনায় প্রায় ৭৫০ টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ছত্তীসগঢ়ে সরকারি সূত্রে ২০০৮ সালে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ডাইনি সন্দেহে বছরে অন্তত ১০০ জন নারীকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়।

রাধা কুমারের মতে ধর্ষণ ভারতে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘঠিত অপরাধগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার সুরক্ষা প্রধানের মতে ভারতে ধর্ষণ একটি "জাতীয় সমস্যা"। ১৯৮০ এর দশক থেকে, নারীবাদী সংগঠনগুলি বৈবাহিক ধর্ষণকে বেআইনি ঘোষণার দাবি জানাচ্ছে, কিন্তু ফৌজদারী আইন (সংশোধনী) আইন, ২০১৩ তার ধারা ৩৭৫ এর অধীনে ব্যতিক্রম ধারায় বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যতিক্রমটি বজায় রাখে, যেখানে বলা আছে: "নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সংসর্গ বা যৌনক্রিয়া ধর্ষণ নয়, যেখানে স্ত্রীর বয়স পনের বছরের নিচে নয়"। যদিও প্রতি মাথাপিছু হিসেবে অভিযোগের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম, এমনকি অনেক উন্নত দেশের তুলনায়ও কম, কিন্তু তবু প্রতি ২0 মিনিটে একটি অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়।

ভারতীয় শহরগুলির মধ্যে যেগুলিতে ধর্ষণের অভিযোগের হার সবচেয়ে বেশি দিল্লি সেগুলির মধ্যে একটি। বিভিন্ন সূত্রে দেখা যায় যে ১৯৯০ থেকে ২০০৮ এর মধ্যে ভারতে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

যৌন হেনস্থা

ইভ টিজিং একটি পুরুষতান্ত্রিকতা পুরুষরা মহিলাদের যৌন হয়রানি বা যৌন হেনস্থা করার জন্য ব্যবহার করে। অনেক সমাজকর্মী নারীর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য "পশ্চিমা সংস্কৃতির" প্রভাবকে দোষারোপ করেন। ১৯৮৭ সালে, নারীদের

অশালীনভাবে উপস্থাপন (নিষিদ্ধকরণ) আইন পাস হয় যাতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা প্রকাশনায়, রচনায়, চিত্রশিল্পে বা অন্য কোনও ভাবে নারীকে অশালীনভাবে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৯০ সালে নথিবদ্ধ নারীর বিরুদ্ধে মোট অপরাধের সংখ্যার অর্ধেক কর্মস্থলে নিপীড়ন ও হয়রানি সম্পর্কিত। ১৯৯৭ সালে একটি ঐতিহাসিক রায়ে, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। এবিষয়ের প্রতিকার এবং অভিযোগের নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকাও আদালত জারি করেন। জাতীয় মহিলা কমিশন পরবর্তীকালে এই নির্দেশিকাগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে নিয়োগকর্তাদের জন্যে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করে। ২০১৩ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্টের এক সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচাপতির বিরুদ্ধে একজন আইন-গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীর করা যৌন হেনস্থার অভিযোগের তদন্ত করেন। কর্মক্ষেত্রে নারীর হয়রানি রোধ করার জন্য ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে কর্মক্ষেত্রে নারীদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিষিদ্ধকরণ ও প্রতিকার) আইন(Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act) কার্যকর করা হয়।

অ্যাকশনএড ইউকে'র একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ভারতে ৮০% নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে, তা সে অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্য, অনঅভিপ্রেত শারীরিক স্পর্শ বা নির্যাতন যেভাবেই হোক না কেন। অনেক ঘটনায়ই অভিযোগ নথিবদ্ধ হয় না কারণ নির্যাতিতারা তাদের পরিবারের থেকে সমর্থন ও সহমর্মিতা না পাওয়ার আশঙ্কায় ভোগে।

অনৈতিক পাচার (প্রতিরোধ) আইন ১৯৫৬ সালে পাস হয়। তবে অল্পবয়সী ও বয়স্ক মহিলাদের পাচারের অনেক ঘটনাই প্রকাশিত হয়েছে। এই মহিলাদের হয় পতিতাবৃত্তি, গার্হস্থ্য কাজ বা শিশু শ্রমে বাধ্য করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া